

জনবিক্ষোভে উত্তাল রাজপথ : সঙ্কটে নেপালের প্রজাতন্ত্র

Posted on October 24, 2025 by Sushovan Dhar

রাজতন্ত্রের পতনের সতেরো বছর পর, নেপালের ভঙ্গুর প্রজাতন্ত্র আবার এক নতুন সংকটের মুখোমুখি। সেপ্টেম্বরের বিদ্রোহে ফুটে বেরিয়েছে এক প্রজন্মের তীব্র ক্ষোভ, গণতন্ত্রের অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণের দাবি।

“দুর্নীতির অবসান চাই!”

“মিথ্যা আর নয়!”

“অজুহাত নয়, আমাদের চাকরি দাও!”

সেপ্টেম্বরের শুরুতেই এই সব স্লোগানে মুখরিত হয়ে উঠেছিল কাঠমান্ডুর

রত্নাপার্ক। শত শত তরুণ-তরুণী হাতে বানানো প্ল্যাকার্ড আকাশের দিকে তুলে ধরে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। কিছু পোস্টারে ইংরেজিতে লেখা ছিল – “Democracy, Not Dictatorship” (গণতন্ত্র, স্বৈরশাসন নয়), কিছু ছিল সহজ নেপালি ভাষায় দাবি: রোটি, কপড়া, ঘর (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান)।

বাইশ বছর বয়সী অর্জুন দাঁড়িয়ে ছিল এক নিচু দেওয়ালের উপর, হাতে মেগাফোন। সদ্য অর্থনীতিতে স্নাতক অর্জুন প্রায় এক বছর ধরে বেকার। “আমি পড়াশোনা করেছি এখানে কাজ করার জন্য,” ভিড়কে উদ্দেশ্য করে সে বলে, “কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ মানে এখন বিদেশের চাকরির তালিকায় নাম লেখানো। এটাই কি সেই গণতন্ত্র, যার জন্য আমরা লড়েছিলাম?” কাছেই চিতওয়ান জেলার দুই সন্তানের মা পুষ্পা হাতে একটি প্ল্যাকার্ড ধরে ছিলেন, তাতে লেখা – “আমাদের তরুণদের উপসাগরে বিক্রি করা বন্ধ করো।” তাঁর স্বামী সাত বছর ধরে কাতারে কাজ করছেন। চোখে টিয়ার গ্যাসের জ্বালায় আসা জল মুছে তিনি বললেন, “আমি চাই না আমার ছেলেরা-ও দেশ ছেড়ে যাক। আমরা একসাথে বাঁচতে চাই, এইভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নয়।” মোটামুটিভাবে অনুমান করা যায় যে নেপালের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ – অর্থাৎ প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ – বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য অভিবাসনে থাকতে বাধ্য হয়।

“আমরা আমাদের দেশকে এমন এক দেশে রূপান্তরিত করতে চাই – যেমন ডেনমার্ক, যেখানে দুর্নীতি নেই,” বলছিলেন ২০ বছর বয়সী অঞ্জনা তিওয়ারি, কাঠমান্ডুর রাস্তায় তরুণ বিক্ষোভকারীদের ভিড়ে অস্থায়ী শিবিরে ময়লা পরিষ্কার করতে করতে। তিনি আসলে যা বলছিলেন তা অসংখ্য তরুণ প্রতিবাদীর মনের কথা। “আমরা এমন একজন সহানুভূতিসম্পন্ন, পরিশ্রমী নেতাকে নির্বাচন করতে চাই, যিনি আমাদের দেশকে সব দিক থেকে আরও সুন্দর করে তুলবেন।”

সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হঠাৎ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার সরকারি সিদ্ধান্ত বিক্ষোভের তাৎক্ষণিক সূত্রপাত ঘটায়। পরে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলেও আন্দোলন থামেনি। স্লোগানগুলো থেকেই বোঝা

যাচ্ছিল, মানুষের ক্ষোভের শিকড় অনেক গভীরে —রাজতন্ত্র বিলুপ্তির পর সতেরো বছর ধরে নেপালের প্রজাতন্ত্র শক্তিশালী হওয়ার বদলে যেন ভিতর থেকে ফাঁপা হয়ে গেছে। এই শূন্যতার অনুভূতি থেকেই এই বিস্ফোরণ। সরকার পতন।

রাজতন্ত্রের পতন

বর্তমান হতাশার শিকড় বুঝতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে নেপালের সাম্প্রতিক ইতিহাসে। ২০০১ সালের জুন মাসের এক গ্রীষ্মরাতে এক মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে নারায়ণহিতি রাজপ্রাসাদে, রাজপরিবারের সরকারি বাসভবনে রাজপরিবারের অধিকাংশ সদস্যকে হত্যা করা হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন রাজা বীরেন্দ্র, রানি ঐশ্বর্যা এবং যুবরাজ দীপেন্দ্র। এই ভয়াবহ ঘটনার পর রাজমুকুট যায় বীরেন্দ্রর ভাই জ্ঞানেন্দ্রর হাতে।

রাজা জ্ঞানেন্দ্রর কর্তৃত্ববাদী চরিত্র খুব দ্রুতই প্রকাশ পায়। ২০০৫ সালের মধ্যেই তিনি সংসদ ভেঙে দেন, সব রাজনৈতিক দলকে নিস্ক্রিয় ঘোষণা করে জরুরি অবস্থা জারি করেন। সংবাদমাধ্যমের উপর সেন্সরশিপ চাপানো হয়, প্রতিবাদী মানুষে জেল ভরে যায়।

এর জবাবে শুরু হয় এক গণঅভ্যুত্থান। ২০০৬ সালের এপ্রিলে লক্ষ লক্ষ মানুষ নেমে আসেন রাস্তায়। “আমাদের হাতে ছিল না কিছুই, শুধু আমাদের কণ্ঠ,” বলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা অঞ্জনা, তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিছিল করার স্মৃতি ভেসে ওঠে। “আমরা হাতে তুলে নিয়েছিলাম প্ল্যাকার্ড – ‘আর রাজা নয়’- গলায় রক্ত তুলে গান গেয়ে গেছি অবিরাম ।” উনিশ দিন ধরে বিক্ষোভকারীরা অসমসাহসে ভর দিয়ে, কারফিউ অমান্য করে গুলির সামনে বুক চিতিয়ে রাস্তায় লড়াই করেছিলেন। পাহাড়ি এলাকার কৃষকেরা শিল্পশ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিল করেছেন, নারীরা সভাস্থল ঘিরে মানবপ্রাচীর গড়ে তুলেছেন। ছাত্রছাত্রীরা ভরিয়ে তুলেছিল কাঠমান্ডুর সব চত্বরগুলো। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের শক্তিই জ্ঞানেন্দ্রকে আবার সংসদ চালু করতে বাধ্য করে

।

দুই বছর পর, ২০০৮ সালের মে মাসে, রাজতন্ত্রের আনুষ্ঠানিক বিলোপ ঘটে। রাজকীয় পতাকা যখন নামিয়ে নেওয়া হচ্ছিল, জনতার উল্লাস ফেটে পড়ছিল—হাতে হাতে ব্যানার, তাতে জ্বলজ্বল করছে “লোকতন্ত্র জিন্দাবাদ” (গণতন্ত্র চিরজীবী হোক)। রাজপ্রাসাদ পরিণত হল জাদুঘরে, আর নেপাল আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেকে একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করল।

শূন্য দশকের শুরুতে, বিশ্বের বহু জায়গায় বাম আন্দোলন যখন নব্য-উদারবাদের জয়যাত্রা এবং পুরনো সমাজতান্ত্রিক নিরীক্ষাগুলির পতনের চাপে পিছলে পড়ছে, নেপাল এক দুর্লভ আশার আলো দেখিয়েছিল। মাওবাদী বিদ্রোহ এবং গণ-অভ্যুত্থানের ফলে রাজতন্ত্রের পতন, বৈশ্বিক বামের বলয়ে যেন নতুন প্রাণের যোগান দিয়েছিল। হিমালয়ের কোলে ছোট এক পার্বত্য দেশের গরিব, শ্রমিক ও শিক্ষার্থীরা ধাক্কা দিয়ে ইতিহাসের দরজা খুলে দিয়েছিল, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঠিক ওই সময়েই বিশ্বের অন্যত্র সমাজবাদী শক্তিগুলি ক্রমে শক্তিহীন হয়ে পড়ছে।

লাল প্রতিশ্রুতি

রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং নতুন প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রে কমিউনিস্টদের প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশিত ছিল। এক দশকের সশস্ত্র সংগ্রাম থেকে উঠে আসা মাওবাদীরা এবং ঐক্যবদ্ধ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের (ইউএমএল) মিলে সংসদে প্রধান শক্তি হয়ে উঠলো। তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল এক “নতুন নেপাল” – যেখানে ভূমিহীনদের জন্য জমি, তরুণদের জন্য কাজ, এবং দলিত ও সংখ্যালঘুদের জন্য সমতা নিশ্চিত হবে। একসময় গেরিলা পোশাকে যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা যোদ্ধারা সংসদের আসনে বসে ভোটারদের আশ্বাস দিচ্ছিল যে জনগণের ত্যাগ বৃথা যায়নি।

“মনে হচ্ছিল যেন ইতিহাস আমাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে,” বললেন ভীম, এক প্রাক্তন

মাওবাদী যোদ্ধা। “আমরা প্ল্যাকার্ড বহন করেছিলাম, তাতে লেখা ছিল ‘জনতার হাতে ক্ষমতা’–আমরা সত্যিই তা বিশ্বাস করতাম।” কিন্তু সেই বিশ্বাস অচিরেই তিক্ততায় পরিণত হল। একের পর এক বিশ্বাসঘাতকতা – লাঞ্ছিত একটা পর্যায় – শুরু হল রাজনৈতিক অচলাবস্থা। সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকে, কারণ রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আকচা-আকচি করছিল, আর দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছিল গভীর থেকে আরো গভীরে। নতুন প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরের পর থেকে দেশের তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দল — নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি (ইউএমএল), মাওবাদী এবং নেপালি কংগ্রেস — ক্ষমতার জন্য এক অবিরাম দ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকেছে।

২০১৮ সালে মাওবাদী ও ইউএমএল একত্রিত হয়ে নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করে। দলটির নেতৃত্বে ছিলেন কেপি শর্মা ওলি এবং পুষ্পকমল দাহাল, যিনি “প্রচণ্ড” নামে পরিচিত। তাঁরা যৌথ নেতৃত্বে কাজ চালাতে থাকেন এবং সংসদে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। জনগণ এই ঐক্যকে উৎসাহভরে স্বাগত জানিয়েছিল। সমাবেশগুলোতে “অবশেষে স্থিতিশীলতা” লেখা প্ল্যাকার্ড দেখা যেত। কিন্তু ২০২০ সালে ওলির সংসদ ভেঙে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সেই আশাবাদের গোড়ায় কুড়ুল মারে। দেশ আবারও নতুন এক অস্থিরতা ও শাসন সংকটে নিমজ্জিত হয়। প্রতিবাদকারীরা রাস্তায় নেমেছিল প্ল্যাকার্ড নিয়ে, “এর জন্য তো আমরা রাজাকে অপসারণ করিনি।” পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট ওলির সিদ্ধান্ত বাতিল করলেও ততদিনে জনগণের আস্থা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। অল্প কিছুদিন মধ্যেই দল ব্যক্তিগত অহংবোধ ও আইনি বিরোধের চাপে বিভক্ত হয়ে যায়।

“প্রতিবারই আমরা ভাবি, এই তো আমরা নেতৃত্ব পেয়েছি, তারা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে,” বললেন রীতা, এক পোশাকশিল্পের শ্রমিক। “আমাদের প্ল্যাকার্ডের ভাষা বদলায়, কিন্তু বার্তা একই থাকে – আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা বন্ধ করো।” রাজনৈতিক নাটকের বাইরে মানুষের দৈনন্দিন জীবন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছে। বেকারত্ব ভয়াবহভাবে বেড়েছে। অভিবাসী শ্রমিকদের রেমিট্যান্স এখন নেপালের অর্থনীতির প্রধান ভরসা, তার দাম দিচ্ছে

গ্রামগুলো – তারুণ্য-যৌবনশূন্য নিঃসঙ্গ ভূমি । কাঠমান্ডুতে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট গড়ে উঠছে, অথচ গ্রামীণ স্কুলগুলো একের পর এক বন্ধ হচ্ছে। স্থায়ী এবং উচ্চ মাত্রায় দারিদ্র রয়ে গেছে।

চিতওয়ানের এক মা, পুষ্পা, তার পুরোনো প্ল্যাকার্ডটি এক সাংবাদিককে দেখিয়ে বললেন, “আমার সন্তানরা তাদের বাবাকে চায়, রেমিট্যান্স নয়।” তার কাছে প্রজাতন্ত্রের ব্যর্থতা কেবল রাজনৈতিক নয়, গভীরভাবে ব্যক্তিগত বিষয়। মহামারির সময় সেই ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়, অক্সিজেনের অভাবে রোগীরা তখন হাসপাতালের বাইরে প্রাণ হারাচ্ছিলেন। সর্বব্যাপী দুর্নীতি টিকা কেনার প্রক্রিয়া সফল হতে দেয়নি,স্বাস্থ্য-ব্যবস্থায় নাভিশ্বাস, ফলে অসংখ্য পরিবার চিকিৎসা না পেয়ে প্রিয়জনদের কবর দিতে বাধ্য হল। “ ‘আমরা শ্বাস নিতে পারছি না’ লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে বেরিয়েছিলাম পুলিশের টিয়ারগ্যাস ছোড়ার আগেই,” স্মরণ করেন লক্ষ্মী, এক ছোট দোকানমালিক, ২০২১ সালে তিনি কোভিডে তাঁর বাবাকে হারান।

উপেক্ষিত সতর্কবার্তা

২০২২ সালে কাঠমান্ডুর ভোটাররা দেশ ও প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে চমকে দেন, যখন তারা একজন র্যাপার ও স্বাধীন প্রার্থী, বালেন শাহ-কে মেয়র হিসেবে নির্বাচিত করেন। তরুণ সমর্থকরা স্লোগান দিয়েছিল, “দল নয়, দুর্নীতিও নয়।” শাহর এই জয় কেবল প্রতীকী ছিল না – ইঙ্গিত ছিল যে নাগরিকরা ঐতিহ্যবাহী দলীয় রাজনীতির বাইরে বিকল্প খুঁজছে। “তিনি প্রথম ব্যক্তি যাকে আমরা সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম,” বললেন সাবিনা, এক ছাত্র আন্দোলনকর্মী। “তিনি রাজনীতিকে আবার মানুষের মতো করে তুলেছিলেন।” রাজনৈতিক শ্রেণির প্রতি ব্যাপক ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এটি ছিল নেপালের নিজস্ব এক মুহূর্ত – ২০০১ আর্জেন্টিনার স্লোগানের মতো, ‘Que se vayan todos’ (“সবাই চলে যাক”)
– যদিও তা প্রকাশ পেয়েছিল আরও নীরব, অ-রাজনৈতিক ভঙ্গিমায়।

মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলো, এমন পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখে কিছুটা শঙ্কিত হলেও, ইচ্ছাকৃতভাবে চোখ বুজে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা বালেন শাহের বিজয়ের অর্থ ও তার প্রভাব নিয়ে বিশ্লেষণ তো করেইনি, উলটে একে একটা ব্যতিক্রম হিসেবে উড়িয়ে দেয়। আত্মতুষ্টি ও সতর্কবার্তাগুলির প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েছিল তাদের কাজকর্মে – তারা আগের মতোই ‘সব কিছু স্বাভাবিক’ভাবে চালিয়ে যেতে থাকে, সাধারণ মানুষের দুর্দশার প্রতি সামান্যতম মনোযোগ দেখা যায় না।

২০২২–২৩ অর্থবছরে নেপালের ফেডারেল গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিগুলো সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্থবিরতা ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের চাপে ক্ষয় পেতে শুরু করে। নেপালের অধিকাংশ পরিবারের কাছে এর অর্থ আসলে মারাত্মক কষ্ট – বিশেষত যারা দিনমজুরি, কৃষিকাজ বা অনিশ্চিত জীবিকায় ভর দিয়ে দিন চালান। অর্থনৈতিক দুরবস্থার সবচেয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল মুদ্রাস্ফীতি। ২০২২–২৩ সালে ভোক্তা মূল্যসূচক গড়ে ৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, আগের বছরের প্রায় ৬.৩ শতাংশ থেকে একটা যথেষ্ট বড় উল্লম্ফন। বৈশ্বিক মূল্যের উল্লম্ফনের তুলনায় এই সংখ্যা হয়তো সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু সীমিত আয়ের নেপালি পরিবারগুলোর জন্য এটা অনেক বড় ধাক্কা – অনেককেই প্রতিদিন তিন বেলার বদলে দুই বেলা খাওয়া অভ্যাস করতে বাধ্য হতে হয়েছে। শুধু খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতিই ৬.৬ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছিল, যেখানে চাল, রান্নার তেল ও মসলা – এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম দ্বিগুণ অঙ্কে বেড়ে যায়। রেস্তোরাঁ ও হোটেল খাতে, যা সাধারণত নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের নাগালের মধ্যে ছিল, মূল্যস্ফীতি ১৪ শতাংশেরও বেশি ছাড়ায়। একই সময়ে পরিবহন ব্যয় আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে – পেট্রোল ও ডিজেলের দাম ৩০ থেকে ৪৭ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যায়। এই পরিস্থিতি রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ফলে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে অস্থিরতার সরাসরি ফলাফল ছিল।

এই পরিসংখ্যানগুলো সাধারণ নাগরিকদের জন্য কোনো বিমূর্ত সংখ্যা ছিল না। এর বাস্তব প্রভাব পড়েছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনে – ছাত্রছাত্রীদের জন্য

বাসভাড়া দ্বিগুণ হয়ে যায়, কৃষকদের জন্য সার সরবরাহের খরচ বেড়ে যায়, আর পরিবারগুলো মাছ-মাংস খাওয়া কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট এমনকি “শ্রিংকফ্লেশন”-এর কথাও রিপোর্ট করে – যেখানে দোকানগুলো চুপিচুপি পণ্যের প্যাকেটের আকার কমিয়ে দেয়, কিন্তু দাম আগের মতোই রাখে, ফলে ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা আরও ক্ষয় হতে থাকে। একদিকে বাড়তি দামের চাপে পরিবারগুলো নিস্পিষ্ট হচ্ছিল, অন্যদিকে স্থবির ও অনিশ্চিত কর্মসংস্থানের কারণেও তারা নাজেহাল হয়ে পড়েছিল। ২০২২ সালে সাধারণ জনগণের বেকারত্বের হার ছিল আনুমানিক ১০–১১ শতাংশ। কিন্তু তরুণদের (১৫–২৪ বছর বয়সী) ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার ছিল ২০ শতাংশেরও বেশি – কয়েকটি অনুমান অনুযায়ী তা ২২.৭ শতাংশে পৌঁছেছিল। ফলাফল ছিল ভয়াবহ: প্রতি পাঁচজন তরুণের একজন হয় বেকার, নয়তো খুব কম মজুরির অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত ছিল। রাজতন্ত্র বিলুপ্তির পর যে প্রজন্মটি বেড়ে উঠেছিল, তাদের কাছে আশার জায়গা দখল করে নেয় হতাশা – যে সুযোগের প্রতিশ্রুতি একসময় “নতুন নেপাল”-এর স্বপ্নে দেওয়া হয়েছিল, তা এখন দূর অতীতের মতো মনে হয়।

বৈশ্বিক দক্ষিণে অধিকাংশ দেশের মতোই, নেপালের শ্রমবাজারও মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক বা দিনমজুরির মত কাজ্রে উপর নির্ভরশীল। সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। কোন কোন মাসে নামমাত্র মজুরি বা বেতনের অঙ্ক সামান্য বেড়েছিল, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি সেই অস্থায়ী বৃদ্ধিকে সম্পূর্ণভাবে নিস্ফল করে দিয়েছে। প্রকৃত মজুরি – অর্থাৎ শ্রমিকরা যেটুকু অর্থ দিয়ে বাস্তবে কিছু কিনতে পারেন – তা স্থবির থেকে যায় বা আরও কমে যায়। এই পতনের সবচেয়ে তীব্র প্রভাব পড়ে কৃষিশ্রমিক, দিনমজুর এবং ক্ষুদ্র সেবাক্ষেত্রের কর্মীদের ওপর। শহুরে অভিজাত শ্রেণি একদিকে নিজেদের এই মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা থেকে রক্ষা করতে পেরেছে, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে এর সুযোগও নিয়েছে; কিন্তু দরিদ্র জনগোষ্ঠী রয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত।

এই বৈষম্য নতুন কিছু নয়। নেপালের আয়ের কাঠামো বহুদিন ধরেই অসম ছিল, তবে ২০০৮ সালের পর সেই ফারাক আরও বেড়ে যায়। জরিপ অনুযায়ী, পারিবারিক আয়ের যে

অংশ কৃষি থেকে আসত, তা ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ৬০ শতাংশেরও বেশি ছিল – কিন্তু ২০২২–২৩ সালে তা নেমে আসে মাত্র ১৬–১৭ শতাংশে। একসময় গ্রামীণ জীবিকার মেরুদণ্ড হিসেবে থাকা কৃষি এখন অবক্ষয়ের পথে, ফলে গ্রামীণ সমাজ ক্রমশ অভিবাসন ও রেমিট্যান্সের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। একই সময়ে, সর্বোচ্চ আয়ের দশভাগ মানুষ মোট আয়বৃদ্ধির বড় অংশ দখল করে নেয়, আর সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগে আসে অতি সামান্য।

রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় নেপালের অর্থনীতিতে একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং ২০২২ সালের মধ্যে তা দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রায় ২৫ শতাংশে পৌঁছে যায়। এটি অনেক পরিবারের জন্য একদিকে জীবনরক্ষার ভরসা, অন্যদিকে এক ধরণের ফাঁদে পরিণত হয়েছে। রেমিট্যান্স পরিবারগুলোকে মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কা সামলাতে, স্কুলের ফি দিতে এবং ঘরবাড়ি নির্মাণে সাহায্য করেছে ঠিকই কিন্তু একই সঙ্গে গ্রামগুলোকে শূন্য করে দিচ্ছে এবং পরিবারগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে তুলছে।

ফলে নেপাল এক অনিশ্চিত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে—গালফ দেশসমূহ, মালয়েশিয়া ও ভারতের মতো বিদেশে কর্মরত লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ঘামে টিকে থাকা এক অর্থনীতি হিসেবে। কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন বিমানবন্দরে রেমিট্যান্স ট্রান্সফারের মতোই ঘনঘন পৌঁছানো কফিনগুলো এই শ্রম-রপ্তানি নির্ভর মডেলের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানবিক মাশুলের নির্মম প্রতীক হয়ে উঠেছে।

কোভিড-১৯ মহামারি নেপালের জনগণের মধ্যে ইতিমধ্যে ধূমায়িত হয়ে থাকা উপেক্ষিত হওয়ার অনুভূতিকে আরও গভীর করে তোলে। হাসপাতালগুলোতে অক্সিজেন ফুরিয়ে গেছে, টিকা কেনার প্রক্রিয়া দুর্নীতির অভিযোগে জর্জরিত হয়েছে, আর অসংখ্য রোগী চিকিৎসা না পেয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। ২০২২ সালেও সরকারি ব্যর্থতার সেই অনপনীয় স্মৃতি পরিবারগুলিকে তাড়া করে বেড়িয়েছে, রাষ্ট্রের প্রতি অবিশ্বাসকে আরও প্রবল করেছে।

যে বিশ্বাসঘাতকতা ও উপেক্ষিত হওয়ার বোধ আগে থেকেই ছিল, মহামারির অভিঘাতে তা বহুগুণ বেড়ে যায়—দেশজুড়ে সৃষ্টি হয় অনিশ্চয়তা ও মানসিক অস্থিরতা। টিকা কেনার দুর্নীতি, অক্সিজেন সংকট ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভেঙে পড়া—সবকিছু মিলে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক শ্রেণির প্রতি মানুষের আস্থা ভেঙে পড়ে। ২০২২ সালের পর, সেই আস্থাহীনতার ওপর চেপে বসে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব এবং রাজনৈতিক অচলাবস্থা—যেগুলো এক ভয়াবহ জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের উপর আরও এক স্তরের বৈধতা-সংকট তৈরি করে।

২০২২ সালে দেখা যায় নেপাল কেবল অর্থনৈতিক মন্দার সঙ্গেই নয়, এক গভীর সামাজিক সংকটের সঙ্গেও লড়াই করছিল। একদিকে খাদ্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি, অন্যদিকে বাড়তে থাকা বেকারত্ব ও কমে যাওয়া মজুরি – এই দুই চাপে সাধারণ পরিবারগুলো ন্যূনতম জীবনযাত্রার মানও ধরে রাখতে পারছিল না। বৈষম্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল; শহরের সচ্ছল শ্রেণি কোনোভাবে মূল্যস্ফীতি সামলে নিতে পারলেও, গ্রামীণ দরিদ্র জনগণ আরও পিছিয়ে পড়ল। তরুণ প্রজন্মের সামনে বিকল্প বলতে – অভিবাসন অথবা হতাশা।

স্পষ্ট প্রতীয়মান, যে নেপালের সংকট সরকারি বা অন্যান্য প্রতিবেদনে উল্লিখিত পরিসংখ্যানের তথ্যকে ছাপিয়ে গেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ক্রমাবনতির সূচক সেসব। যে প্রজাতন্ত্র একসময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রুটি, কাজ ও মর্যাদার, সেই রাষ্ট্রই এখন খাদ্যের অভাবে জর্জরিত নাগরিকদের খোঁজ রাখছে না, অনিয়মিত ও অনিশ্চিত কাজের বাজার চাঙ্গা করার কোন চেষ্টা করছে না।ফলে সমাজজুড়ে ভেঙে পড়েছে আস্থা ও সংহতির বোধ। ২০২২ সাল থেকে যে বিক্ষোভগুলো ছড়িয়ে পড়েছিল, সেগুলো কোনো আকস্মিক বিস্ফোরণ ছিল না; প্রান্তসীমায় ঠেলে দেওয়া সমাজের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ছিল সেগুলি।

সাম্প্রতিক বিদ্রোহ

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে এসে “জেন জি বিদ্রোহ” দখল করে নেয় নেপালের

রাস্তাঘাট। সরকারের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তই ছিল তাৎক্ষণিক স্ফুলিঙ্গ, কিন্তু যে ক্রোধ হাজারে হাজারে তরুণ-তরুণীকে কাঠমান্ডু, পোখরা, বিরাটনগর ও বুটওয়ালের মতো শহরগুলোর রাস্তায় নামিয়েছিল – তা বহু বছরের সঞ্চিত ক্ষোভের ফল। এরা এমন এক প্রজন্ম, যারা প্রজাতন্ত্রের ছায়ায় জন্মেছে – যাদের সামনে রাখা হয়েছিল সুযোগ, সমতা ও উন্নতির প্রতিশ্রুতি, অথচ বাস্তবে তারা মুখোমুখি হয়েছে বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি এবং এমন এক রাজনীতির, যা তাদেরকেই ক্রমাগত অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। ছাত্রছাত্রী, বেকার স্নাতক, তরুণ শ্রমিক – কিশোর বা বিশের গোড়ায় যাদের বয়স – তাদের উত্তেজিত সমাবেশ ও বিদ্রোহে ভেঙে গেল ব্যারিকেড, প্ল্যাকার্ডে প্ল্যাকার্ডে ভরে গেল শহরের চত্বরগুলো; তাদের দাবি ছিল রুটি, চাকরি আর ন্যায়বিচার। সরকারি দমননীতি ছিল নির্মম – টিয়ার গ্যাস, জলকামান, রাবার বুলেট, এমনকি গুলি চলে। সেপ্টেম্বারের মাঝামাঝি পর্যন্ত অন্তত ৭২ জন নিহত এবং ২১০০-রও বেশি মানুষ আহত হন। রাজতন্ত্র পতনের পরে এটিই ছিল নেপালের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানগুলোর একটি।

সরকার ও দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীর দাবি সত্ত্বেও, বামপন্থীরা এই আন্দোলনগুলোকে “বিদেশি প্ররোচনায় সংগঠিত ষড়যন্ত্র” বলে উড়িয়ে দিতে পারে না। এর অর্থ নেপালের সেই তরুণদের বাস্তব জীবনের যন্ত্রণাকে অস্বীকার করা, মুদ্রাস্ফীতি, কমে যাওয়া প্রকৃত মজুরি, এবং গ্রামীণ জীবিকার ধ্বংসে যাদের জীবন ক্রমশ অকরুণ ধ্বংসের অনিবার্যতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অনেক প্রতিবাদী ছিলেন অভিবাসী শ্রমিকদের সন্তান – যারা রেমিট্যান্সের অর্থে বড় হয়েছেন, এখন তাদেরও সামনে একই নিষ্ঠুর দ্বিধা: বিদেশে পাড়ি জমাও, নইলে বেকারত্বের জ্বালায় পচে মর। তাদের স্লোগানগুলো ওয়াশিংটন বা বেইজিং থেকে আসেনি। ভুখা পেটের জ্বালা ও ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের স্তুপ থেকে রূপ পেয়েছে। আন্দোলনের ফলে প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির পদত্যাগ কোন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের প্রমাণ নয় – এর দাপ বিস্ফোরিত হয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত, আত্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক শ্রেণির বিরুদ্ধে জমে থাকা জনগণের গভীর ক্রোধ থেকে। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সুশীলা

কার্কির উত্থান আপাতত কোনো সমাধান নয়; এক অস্থায়ী বিরামচিহ্ন মাত্র। বিদ্রোহ উন্মোচন করেছে নতুন প্রজন্মের তীব্র অধৈর্য – তারা আর ওপর থেকে পরিবর্তনের অপেক্ষায় নেই। নেপালের বামপন্থীদের জন্য বার্তা স্পষ্ট: এই ক্ষোভের সঙ্গে নিজেদের পুনরায় যুক্ত করতে হবে, তাকে সংগঠিত দিশা দিতে হবে—নইলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর হাতে ভবিষ্যৎ ছেড়ে দেওয়ার ঝুঁকি নিয়ে বসে থাকতে হবে।

নেপালের বিদ্রোহকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভাবার কারণ নেই। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়া বৃহত্তর দ্রোহ-তরঙ্গের অংশ হিসেবে দেখতে হবে। সাম্প্রতিক অতীতে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ থেকে বর্তমানে নেপাল – দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের কাদায় ডুবে থাকা রাজনৈতিক অভিজাত গোষ্ঠী এবং ভঙ্গুর অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রবল গণ-অভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করল।ইন্দোনেশিয়ার তরুণ প্রজন্মও ইতিমধ্যে পথে নেমেছেন,সাম্প্রতিক কালের মধ্যে বৃহত্তম জনসমাবেশ ঘটেছে।

অভ্যুত্থানগুলির মধ্যে মিলগুলো বিস্ময়কর ও স্পষ্ট: সরকারগুলি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ, জীবিকার নিরাপত্তা দিতে অক্ষম; শাসক দলগুলো স্বজনপোষণ, দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারিতে ডুবে আছে; নাগরিকরা বিপুল সংখ্যায় পথে নেমে প্রতিবাদে গলা ফাটানোকেই একমাত্র রাস্তা বলে মনে করছেন। এই অঞ্চলে – আসলে বিশ্বের বহু অংশেই – তরুণ প্রজন্ম আর মেনে নিতে চাইছেন না ক্ষয়িষ্ণু গণতন্ত্রের ভন্ডামি এবং নিছক বেঁচে থাকার রাজনীতি। তারা একযোগে জীবনে মর্যাদা, অন্যায়ের জবাবদিহি ও প্রকৃত পরিবর্তনের দাবিতে সংঘবদ্ধ হচ্ছেন, গলা তুলছেন।

ভবিষ্যৎ?

তবুও নেপালের রাজনৈতিক নেতৃত্বের হুঁশ নেই – যেন তারা অতীতেই বাস করছে – অস্বীকার আর এড়িয়ে যাওয়া, এতেই তাদের প্রতিক্রিয়া সীমাবদ্ধ। বিক্ষোভের

পেছনে থাকা গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ স্বীকার না করে, ডান ও বাম উভয় শিবিরই এক গান গাইছে – এই আন্দোলনের পিছনে আছে বিদেশি প্ররোচনা। যুক্তরাষ্ট্রকে তুলে ধরা হচ্ছে “অদৃশ্য হাত” হিসেবে – তারাই যেন নেপালের তরুণ প্রজন্মকে অর্থায়ন ও নির্দেশ দিচ্ছে প্রজাতন্ত্রকে অস্থিতিশীল করে তোলার জন্য। এই ধরনের বয়ান সাধারণ মানুষদের মধ্যে থাকা সাম্রাজ্যবিরোধী মনোভাবকে হয়তো অল্প উসকে দিতে পারে, কিন্তু এতে একটা মৌলিক বিষয় উপেক্ষিত হয় – নেপালের জনগণের ক্ষোভের মূল কারণ বিদেশি ষড়যন্ত্র নয়, বরং ক্ষুধা, বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং গণতান্ত্রিক পরিসরের সংকোচন। আন্দোলনকে “বাইরের চক্রান্ত” বলে হেলাফেলা করা মানে মানুষের সংগ্রামী ক্ষমতা, চেতনা ও এজেন্সিকে অস্বীকার করা এবং রাষ্ট্রের ব্যর্থতাকে আড়াল করা। তাছাড়া এসব অন্ধ অভিযোগের কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণও নেই।

নেপালের সামনে আজ পথ স্পষ্টভাবে তিনটি। একদিকে আছে স্থিতাবস্থার পুনরাবৃত্তি—ক্ষমতাসীন এলিটদের জোট আবারও বদলাবে, বিক্ষোভ হয় দমন হবে নয়তো স্তিমিত হবে আর সংকট থেকে যাবে আগের মতোই। দ্বিতীয় সম্ভাবনা, ডানপন্থী ও রাজতান্ত্রিক শক্তির পুনরুত্থান – যারা শৃঙ্খলা ও স্থিতির মায়া দেখিয়ে গণতন্ত্রবিরোধী পুরোনো ক্ষমতার প্রতীকগুলো ফিরিয়ে আনতে চাইবে। আর তৃতীয় এবং সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনা তৃণমূলস্তরে পুনর্জাগরণ
– শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি দাবি করবেন, কৃষকরা জমি ও নিরাপত্তার লড়াইয়ে নামবেন আর ছাত্রছাত্রী ও তরুণ প্রজন্ম মর্যাদাহীন ভবিষ্যৎ মেনে নিতে অস্বীকার করবেন। পথের পরিসরে জমে থাকা ক্ষোভের বারুদ এক রাজনৈতিক প্রকল্পে রূপ নিতে পারে – যা অসাম্যকে চ্যালেঞ্জ করবে এবং প্রজাতন্ত্রের প্রতিশ্রুতিকে নতুন করে প্রাণ দেবার দাবিতে মানুষকে সংগঠিত করবে।

বিদ্রোহের শক্তিকে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ ও প্রতিনিধিত্বের কাঠামোয় রূপান্তরিত করতে কতটা সক্ষম প্রতিবাদী জনতা তাই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যতের পথ কোন বাঁক নেবে। প্রচেষ্টা কতটা সফল হবে, তার ইঙ্গিত মিলতে পারে ২০২৬ সালের মার্চে নির্ধারিত নির্বাচনে – যেখানে নেপালের জেনারেশন জেড

প্রজন্মের বহু তরুণ, যারা বিক্ষোভে অংশ নিয়েছিল, উৎসাহ নিয়ে ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করেছে তারা।

রাজতন্ত্র বিলুপ্তির সতেরো বছর পর নেপালের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক নীরিক্ষার ব্যর্থ বাস্তবতা আজ স্পষ্ট। একসময় প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন মানে ছিল সমতা, অংশগ্রহণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার। কিন্তু বাস্তবে তা পর্যবসিত হয়েছে অস্থিরতা, দুর্নীতি এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অবিরাম বিশ্বাসঘাতকতায়। বর্তমান আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে, দীর্ঘ হতাশার পরও নেপালের সাধারণ মানুষ রাস্তাঘাট ছাড়েননি – তাঁরা ইতিহাস নির্মানে স্বকীয় ক্ষমতার প্রতি আস্থা হারাননি। অনিশ্চিত রয়ে গেছে একটাই বিষয়: নেপালের রাজনৈতিক শ্রেণিকে কতটা ঝোঁকানো যাবে – অথবা প্রতিস্থাপন করা কি সম্ভব হবে – যাতে এইবারের ত্যাগ প্রকৃত ও স্থায়ী রূপান্তরে পরিণত হয়?

তবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, নেপালের বামপন্থাকে নতুন করে বিবর্তিত হতে হবে – নচেৎ বিলুপ্তি অনিবার্য।

মুল ইংরাজি রচনাটি transform! europe ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে

About the Author



Sushovan Dhar
Author

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint

View All Posts



Sushovan Dhar

+ posts

Editorial Board Member of Alternative Viewpoint